আর্সেনিকের মূল ডিটারজেন্টে!

সব্যসাচী সরকার

প্র ব ন্ধ

অ্যালকেমিস্ট গ্যেবর (Geber) নবম শতকে তাঁমার খোঁজে লাল ইটের মতো একরকম খনিজ দ্রব্য 'রিয়েলগার'কে আগুনে পোড়ান (রিয়েলগার হল আর্সেনিক সালফাইড; বাংলায় 'মনসিল' বা 'মনছাল')। এই দহন প্রক্রিয়ায় স্বাদহীন, সাদা পাউডারের মতো একরকম পদার্থ পাওয়া যায়, আজ যার বিজ্ঞানভিত্তিক নাম আর্সেনিক অক্সাইড। তারপর থেকে বারোশো বছর ধরে লোকের মুখে মুখে এই পদার্থটিই 'আর্সেনিক' বলে অভিহিত হয়ে আসছে।

মৌলিক আর্সেনিক (রসায়নবিদের খাতায় যার সংকেত হল As) কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু এবং আজ পর্যন্ত আর্সেনিকের যত বিষাক্ত ব্যবহার তা এই তথাকথিত 'আর্সেনিক'(অক্সাইড)কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এই অক্সাইড যৌগটি সহজেই জলে গুলে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড যেমন জলে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড (সোডা ওয়াটার) তৈরি করে, ঠিক তেমনই এই অক্সাইডটিও জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যাসিড তৈরি করে। কী অ্যাসিড তৈরি হবে তা নির্ভর করে আর্সেনিকের জারণ অবস্থার (oxidation state) উপর: আর্সেনাস অক্সাইড জলে গুলে গিয়ে তৈরি করে আর্সেনাস অ্যাসিড, আর্সেনিক অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে তৈরি হয় আর্সেনিক অ্যাসিড। এই দুটিই বিষাক্ত, তবে আর্সেনাসের বিষক্রিয়া খুব সহজেই আরম্ভ হয় এবং আর্সেনিক অ্যাসিড মানুষের শরীরে বিজারণ প্রক্রিয়ায় সহজেই আর্সেনাস অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে। আর্সেনিক বিষক্রিয়াতে রোগীর প্রতিক্রিয়া অনেকটা কলেরা রোগীর মতো—বমি, পায়খানা, পেটে ব্যথা; ক্রমে স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে গিয়ে রোগী কোমায় চলে যায় এবং পরে কিডনি, লিভার ইত্যাদি প্রায় সবই অকেজো হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু নিয়ে আসে।

খুইঘাটা: আর্সেনিকের প্রকোপে চলচ্ছক্তিহীন মা-কে বহন করে চলেছে তার কন্যা। অপরিচ্ছন্ন টিউবওয়েল ও ডিটারজেন্টের মিলিত কুফল?

বিগত হাজার বছর ধরে এই আর্সেনিক বিনা বাধায় পানীয় বা খাদ্যসামগ্রীতে বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মহিলাদের খুব প্রিয় ছিল এই পদার্থটা। ভিক্টোরিয়ান যুগে মহিলারা গায়ের রং ফর্সা করার জন্য এটি ব্যবহার করতেন। সেই সময় তাঁরা অবশ্য জানতেন না যে ওই ফর্সা ব্যাপারটির মানে আরসিনোসিস রোগ। সেই সঙ্গে 'ফ্যাশনেবল মার্ডার উইপন' হিসেবেও এর খ্যাতি জুটেছিল প্রচুর। পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চাইলে পিস্তল বা ম্যাকবেথের ছুরির প্রয়োগের চেয়ে নিঃশব্দ আর রক্তপাতবিহীন আর্সেনিকের প্রয়োগ বেশি পছন্দের ছিল। সেই যুগে রাজা, ব্যারনদের ঘরে ঘরে 'ইনহেরিটেন্স পাউডার' বা 'powder de succession' হিসাবে এই আর্সেনিকের বেশ কদর ছিল। এমনকী 'কাউন্সিল অফ টেন' নামে এক সংস্থা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপছন্দের মানুষকে আর্সেনিক প্রয়োগে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার বায়না নিত।

ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে ব্যক্তিদ্বন্দ্বেও ব্যবহৃত হত এই বিষ।

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বিষ হিসাবে এর যথেচ্ছ ব্যবহারের পিছনে একটি প্রধান সুবিধা ছিল এই যে, ডাক্তারি শাস্ত্রে এই বিষক্রিয়া ধরার কোনও উপযুক্ত বিধি জানা ছিল না। তাই সম্রাট নেপোলিয়নের মৃত্যুর কারণ পেটের আলসার হিসাবেই মেডিক্যাল রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়। ১৮৩৬ সালে মার্শ নামে এক রসায়নবিদ স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যাখ্যা দেন। ১৮৪০ সালে আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে কবরস্থিত মৃত ব্যক্তির শরীরে এই পরীক্ষার প্রয়োগ সাফল্য নিয়ে আসে। এই ঘটনাটি এতই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলও শর্লক হোমসের 'আর্সেনিক ডিনারের কেস' নামক রহস্য গল্প লিখে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অপরাধের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। এই সময়ই ফরেন্সিক সায়েন্সের গোড়াপত্তন। আজ আমরা জানি যে, সম্রাট নেপোলিয়নের মৃত্যু আর্সেনিক জনিত, কারণ তাঁর চুলে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যায়। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনকালে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন তার দেওয়াল সবুজ রঙে রং করা ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই সবুজ রঙের বস্তুটি ছিল কপার আর্সেনেট (Sheele's green)। সমুদ্রের ভিজে বাতাসে এই দেওয়ালে ছত্রাকের আবির্ভাব হয়। এই ছত্রাক জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর্সেনিকের অ্যালকিল ঘটিত যৌগ তৈরি করে। পদার্থটি বায়বীয়, কাজেই সহজেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সম্রাট নেপোলিয়নের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

১৮৫১ সালে ব্রিটেনের সরকার 'আর্সেনিক অ্যাক্ট' প্রণয়নের মাধ্যমে এই আর্সেনিক অক্সাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন যাতে ইঁদুর আর পোকামাকড় মারা এবং কিছু ওষুধের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে। আর্সেনিক বহুদিন ধরেই কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক, কাষ্ঠ সংরক্ষক, সিরামিকসের এনামেল এবং রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। আবার পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগে সিফিলিস জাতীয় রোগের চিকিৎসাতেও এটি ব্যবহৃত হত। আজকের উন্নত প্রযুক্তির যুগে উজ্জ্বল আলো যুক্ত মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টর যুক্ত ইলেকট্রিক জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড একটি পরিচিত নাম। ব্যবহৃত হওয়ার পর বর্জিত এই আর্সেনিক যুক্ত বস্তুগুলির যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করার কথা। বড় বড় শহরের বাতাসে তাই এই জাতীয় প্রদূষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমাদের দেশে সোকো বিষের ব্যবহার ছাড়া এই বস্তুটির অন্য অপব্যবহার জানা ছিল না, তাই হঠাৎই গত ৩০-৩৫ বছর ধরে পানীয় জলে এর উপস্থিতির বার্তা আমাদের বিস্মিত করে।

অনেকে হিমালয়, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র বা গঙ্গার বদ্বীপকে এই আর্সেনিকের উৎস বলে দাবি করেন। এতে একটা প্রশ্ন থেকে যায়—আর্সেনিক কি অন্য জায়গায় নেই? ভূগর্ভে আর্সেনিক তার সালফাইড (sulfids) যৌগ হিসাবে একরকম সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলা যায়, কারণ এই ধরনের আকরিকগুলি সাধারণত জলে দ্রবীভূত হয় না। আবার পৃথিবীতে প্রতি ১ কিলোগ্রাম মাটির মধ্যে ২-৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক সাধারণত থেকেই থাকে। তাই স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন মনে আসে। প্রথমত, যদি হিমালয় ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রকে এর উৎস বলে দাবি করা হয় তবে হিমালয়, যমুনা ও পঞ্চনদ থেকে এটি বেরিয়ে আসে না কেন? দ্বিতীয়ত, যদি রাসায়নিক ও কীটনাশকের বহুল ব্যবহারের ফলে কৃষিকার্যে ও প্রচুর পরিমাণে সেচের জল নিকাশে এই দুরবস্থা ঘটে থাকে, তবে সেটি উত্তরপূর্ব ভারতের এক কোণেই সীমাবদ্ধ কেন? আবার হিমালয়, গঙ্গা ও যমুনার স্থিতি বহুকাল আগে থেকে, তবে হঠাৎই গত ৩০-৩৫ বছর ধরে এর উৎপাত শুরু হল কেন? এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে সাধারণ জ্ঞান ছাড়াও বিষয়ের একটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন।

আর্সেনিক যখন মাটির উপরের দিকের স্তরে থাকে তখন অক্সিজেনের প্রভাবে তা আর্সেনিক অক্সাইড হয়েই থাকে। মাটিতে লোহার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। অক্সিজেনের প্রভাবে আর্দ্র পরিবেশে লোহায় মরিচা পড়ে (যার সরলীকৃত রাসায়নিক নাম ফেরিক অক্সাইড) এ তথ্যও আমাদের জানা। ফেরিক অক্সাইড এই বিষাক্ত আর্সেনিক অক্সাইডের সাথে মিশে এক ধরনের জোড়-লবণ (ডাবল সল্ট) তৈরি করে, যাকে সাধারণত আর্সেনিক ফেরিঅক্সাইড-হাইড্রক্সাইড বলা হয়। এই জোড়-লবণ থেকে আর্সেনিককে জলে দ্রবীভূত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ যেন লোহার মরিচার থলিতে বন্দি এক দৈত্য। এভাবেই প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রযুক্তির সাহায্যে আর্সেনিকের প্রভাব থেকে আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে এসেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা তার দান হিসেবে নতুন প্রযুক্তির অমৃত গ্রহণ করলাম কিন্তু তারই ফলে যে-বিষের উৎপত্তি তার জন্য কোনও নীলকণ্ঠের ব্যবস্থা করলাম না। বরং প্রকৃতির থলের বাঁধন থেকে দৈত্যকে দিলাম মুক্তি।

পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে এবং এইসব জলীয় আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলে আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগের যে প্রাদুর্ভাব, তার জন্য আর্সেনিক দায়ী নয়, দায়ী আমাদের নির্বোধ ভাব।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা তার দান হিসেবে নতুন প্রযুক্তির অমৃত গ্রহণ করলাম কিন্তু তারই ফলে যে-বিষের উৎপত্তি তার জন্য কোনও নীলকণ্ঠের ব্যবস্থা করলাম না।

গ্রামের অধিকাংশ পানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় জলে প্রায় ভরে থাকা মাটিতে প্রায় সব জলই কলেরা, আন্ত্রিক জাতীয় রোগের মূল।

এর থেকে মুক্তি পেতে বসানো হল টিউবওয়েল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাপক হারে সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রচলন শুরু হয়ে গেল। ১৯৭০ দশক পর্যন্ত গ্রামে মাখা সাবানের প্রচলন কমই ছিল এবং কাপড়কাচার উপকরণ হিসাবে সোডা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। সাধারণত খাওয়ার জলের জন্য নির্দিষ্ট কুয়ো বা পুকুর চিহ্নিত ছিল যেখানে কাপড় কাচা বা স্নান জাতীয় কাজ নিষিদ্ধ ছিল। সেই সময় দুটি ঘটনা ঘটতে শুরু করল। হাতের কাছে টিউবওয়েল এসে গেল এবং বাজার সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডারে ভরে গেল। সভ্যতা এল, আমরা জীবাণু রহিত পরিষ্কার জল খেলাম, তাতে ভালভাবে স্নান করলাম, ভাল ডিটারজেন্ট যুক্ত সাবান দিয়ে কাপড় কেচে পরতে অভ্যস্ত হলাম। আমাদের কেউ বোঝাল না যে, শুধু পানীয় জলের জন্যই এই টিউবওয়েল, তাই অবারিত ভাবে টিউবওয়েলে স্নান, কাপড় কাচা, বাসনপত্র ধোওয়া শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই টিউবওয়েলগুলি সরকারি হওয়ায় সকলেই সমভাবে ব্যবহারের অধিকার পেল। যে-পরিমাণ জল এই কাজে প্রতিদিন ব্যবহৃত হল তা নিকাশের জন্য উপযুক্ত পাকা নালার ব্যবস্থা হল না। এবং এটাই

হয়ে গেল একটা খুব বড় ভুল।

সাধারণত সাবান ও ডিটারজেন্টগুলি ১০-১৮টা কার্বন পরমাণু-যুক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বক্সিলেট বা সালফেটের সোডিয়াম লবণ। অবশ্য এই রাসায়নিকগুলিকে ভালভাবে সাবানের আকার দিতে গেলে বাইন্ডার (binder) হিসাবে তাতে কিছু পরিমাণ ফসফেট ও সালফেট মেশাতে হয়, বিশেষত খর জলের খরত্ব দূর করতে কিছু পলিফসফেটও ব্যবহার হয়। প্রচুর পরিমাণে সাবান/ডিটারজেন্ট ব্যবহার শুরু হতেই এই ১০-১৮ কার্বন যুক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বক্সিলেট বা সালফেটের সোডিয়াম লবণগুলি তা থেকে মুক্ত হয়ে কাঁচা নর্দমাতে জমতে শুরু করল। এতে বাইন্ডার-উদ্ভূত আরও ফসফেট ও সালফেটও মিশে রইল। এই ফসফেট শৈবাল (algae) জাতীয় উদ্ভিদের খাদ্য। জলে এর মাত্রা বাড়তেই শৈবাল দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তার ফলে জমা জলের উপরে সবুজ শৈবালের একটা আস্তরণ তৈরি হয়। এই আস্তরণ বাতাসের অক্সিজেনকে জমা জলে মিশতে বাধা দেয়। নর্দমার জমা জল অক্সিজেন-শূন্য হয়ে এলে একদল জীবাণু (microbe), যাদের নাম সালফেট রিডিউসিং ব্যাকটেরিয়া (sulfate reducing bacteria), মহাভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মাটি ফুঁড়ে চলে আসে। এদের লোভনীয় খাদ্য হল ওই ১০-১৮ কার্বন যুক্ত লবণগুলি। অক্সিজেনে নিশ্বাস নিতে পারে না বলে এরা সালফেটকে তাদের অবাত শ্বসনের (anaerobic respiration) জন্য ব্যবহার করে এবং এই প্রক্রিয়ায় সালফেট পরিণত হয় সালফাইডে। প্রচুর সালফেট থাকায় এরা বহুকাল তবিয়তে সেখানে ঘরসংসার করে। সূর্য উঠলে উপরের আস্তরণের শৈবাল কিছু অক্সিজেন উৎপন্ন করে (সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়), তবে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডের আস্তরণে জায়গাটি ঢেকে দেয়। ফলে দিনে সূর্যালোকের জন্য এই জীবাণুগুলি কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর সন্ধ্যা থেকে পুনরায় সূর্য ওঠা পর্যন্ত নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে চলে। তাই লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সন্ধ্যা বা রাত্রিতে এইসব বদ্ধ নর্দমা থেকে পচা ডিমের গন্ধ যুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বের হয়। এমনকী এইসব নর্দমার মাটিগুলিও কালো হয়ে যায়। কারণ, বাদামি রঙের ফেরিক অক্সাইড যুক্ত মাটি এই হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতিতে বিজারিত হয়ে ফেরাস সালফাইডে পরিণত হয়, যার রং কালো। ফেরিক অক্সাইড ফেরাস হওয়া মাত্র বন্দি হয়ে থাকা আর্সেনিককে ছেড়ে দেয় যা এবার সহজেই জলে দ্রবীভূত হতে পারে। অতিরিক্ত সালফাইডের উপস্থিতিতে এই আর্সেনিক অক্সাইড আর্সেনিক সালফাইডে পরিণত হতে পারে, কিন্তু সেটিও হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে জলে মিশে যায়। অর্থাৎ আর্সেনিক জলে মুক্তি পেল। বদ্ধ কাঁচা নর্দমায় আর্সেনিকের আধিক্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই আর্সেনিক সহজেই চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির নীচে দিয়ে কলের জলে মিশে যায়। আবার টিউবওয়েলের নীচে যে-জলভাণ্ডার আছে তাতে যদি মিশে যেতে পারে তাহলে পুরো জলভাণ্ডারই কলুষিত হওয়া সম্ভব। এই ঘটনা একদিনে ঘটা সম্ভব নয়, তাই ১৫-২০ বছর পর পুরোমাত্রায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কাজেই আমি যদি আমার ব্যবহারের টিউবওয়েল ও তার নিকাশি ব্যবস্থা খুব ভাল রাখি তবুও আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই আর্সেনিক যুক্ত জলই পান করতে হবে। কারণ অন্যান্য জায়গার টিউবওয়েলগুলির মাধ্যমে মাটির তলার জলভাণ্ডারে রোজই আর্সেনিক মিশে যাচ্ছে। এই জলাস্তর কত বড়, এরকম কাঁচা নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত কত টিউবওয়েল তার সঙ্গে যুক্ত এবং কত বছর ধরে সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দিয়েই এই আর্সেনিক মিশে যাওয়ার একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যেতে পারে। ভারতের যেসব প্রদেশে পানীয় জলে আর্সেনিকের উৎপাত নেই, সেখানে একটা জিনিস লক্ষ করা যায় এবং তা হল উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। আর একটি বড় সুবিধা হল এখানে সূর্যের প্রখর তাপে বছরের বেশির ভাগ সময়েই জলের নিকাশি নালাগুলি প্রায় শুকিয়েই থাকে। জলশূন্য স্থানে সালফেট রিডিউসিং ব্যাকটেরিয়াগুলি অন্যান্য জীবাণুর মতোই বাঁচতে পারে না। কিছু দিন বেঁচে যদিও বা কিছু আর্সেনিক মুক্ত করে, তা বিনা জলে মাটির বুকে আটকেই থেকে যায় এবং হাওয়া ও মাটির সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে আবার বন্দি হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা বদ্ধ আর্সেনিকের জলে মুক্তি পাওয়ার কাহিনি। এছাড়াও অন্য উৎস থেকে আর্সেনিক জলে আসে এবং তা হল আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডার। সাম্প্রতিক এক গবেষণা নিবন্ধে (কারেন্ট সায়েন্স, সৌমেন দে ও অন্যান্য, ২০০৫, ভল্যুম ৮৯, পৃ. ১৯১৩) দেখানো হয়েছে যে, বহুল প্রচলিত ২৬টি সাবান ও ডিটারজেন্টে বেশ ভাল পরিমাণ (গড়ে প্রতি কিলোগ্রামে ৪ মিলিগ্রাম) আর্সেনিক আছে এবং নিত্য ডিটারজেন্ট ব্যবহারের ফলে এই আর্সেনিক জলে মিশছে। ২০০৩ সালের সাবান ও ডিটারজেন্ট উৎপাদনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী (www.hll.com) ৬০০০০ টন সাবান ও ডিটারজেন্টের মাধ্যমে ৪ মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে প্রায় ২৫০ কিলোগ্রাম আর্সেনিক শুধু ২০০৩ সালের সাবান ও ডিটারজেন্টের জন্য জলে যুক্ত হয়েছে। ১০ বছরে এই পরিমাণটা কী হতে পারে তা সহজেই

৬০০০০ টন সাবান ও ডিটারজেন্টের মাধ্যমে ৪ মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে প্রায় ২৫০ কিলোগ্রাম আর্সেনিক শুধু ২০০৩ সালের সাবান ও ডিটারজেন্টের জন্য জলে যুক্ত হয়েছে।

অনুমেয়। আগে সাবানের ব্যবহার কম ছিল, কিন্তু মোট পরিমাণটা ভীতিপ্রদ। সাবানে বাইন্ডার হিসাবে যে-সালফেট ও ফসফেট ব্যবহার করা হয় তাতেই এই আর্সেনিক (আর্সেনেট যৌগ রূপে) অপদ্রব্য হিসাবে থেকে যায়। আমাদের দেশে সাবানের উপকরণাদি প্যাকেটের উপরে মুদ্রিত রাখার কোনও সরকারি বাধ্যবাধকতা নেই। সাবানে ফসফেটের ব্যবহার পৃথিবীর অনেক দেশেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শৈবালের অত্যধিক বাড়বাড়ন্তের ফলে লেকের জলের উপরিভাগ ঢাকা পড়ে জলবাসী প্রাণীর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব না ঘটায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় চালু সাবানে আর্সেনিক প্রায় নেই বললেই চলে। সাবান ও ডিটারজেন্ট থেকে আর্সেনিক দূষণ রোধ করতে গেলে আমাদের তরল সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা উচিত। তরল অবস্থার জন্য এগুলিতে বাইন্ডারের ব্যবহার নেই, তাই বাইন্ডারযুক্ত অপদ্রব্য থেকে আর্সেনিকের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। আবার সালফেট ও ফসফেটের কম ব্যবহারে অবাঞ্ছিত শৈবাল ও শ্যাওলার বৃদ্ধি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কলতলাতে কাপড় কাচা, স্নান করা, বাসন মাজা কমাতে হবে এবং বিশেষ করে দেখতে হবে, এই সাবান যুক্ত ব্যবহৃত জল যেন কাঁচা নিকাশি নালায় জমে না থাকে। মনে রাখা দরকার, মাটির তলার জলাধারে যদি দু-একটি টিউবওয়েল থেকেও এইভাবে আর্সেনিক পৌঁছায় তবে ক্রমে বাকিগুলিতেও তা পৌঁছে যেতে বাধ্য। সরকারি আইন প্রণয়ন করে সাবান ও ডিটারজেন্টের প্যাকেটে কতটা সালফেট, ফসফেট এবং আর্সেনেট আছে তা সাবান ও ডিটারজেন্ট কোম্পানিগুলিকে জানাতে বাধ্য করা উচিত। যে জলভাণ্ডার আমরা বিষিয়ে দিয়েছি তা বিষহীন হতে বহু সময় লেগে যাবে, তবে আর নতুন করে যেন আমরা জলে আর্সেনিক বৃদ্ধিতে সাহায্য না করি।

আমাদের শরীরে বেশ কিছু এনজাইমের (enzyme) মধ্যে আছে একাধিক সালফাহাইড্রিল গ্রুপ (-SH)— একটি সালফার পরমাণু ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর জোট। এনজাইমগুলিকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে এই গ্রুপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর্সেনাস অ্যাসিড এগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক-সালফার বন্ধন তৈরি করে এই এনজাইমগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের শরীরে একান্ত অপরিহার্য একটি বিক্রিয়া-পরম্পরা ঘটে, যার নাম অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন (oxidative phosphorylation)। এই পরম্পরার এক স্থলে 'এটিপি' তৈরির সময় ফসফেটের জায়গাটি আর্সেনেট এসে দখল করে এবং এই অতি প্রয়োজনীয় জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াটিকে ব্যাহত করে। শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করলে সালফাহাইড্রিল গ্রুপগুলির সঙ্গে এর বিক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য পেনিসিলঅ্যামিন ও অন্যান্য 'চিলেটিং এজেন্ট' (chelating agent, যা দুষ্কৃতী আর্সেনিকটিকে নানা দিক থেকে ঘিরে বন্দি করে রাখে, যাতে তা বিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে না পারে) ব্যবহার করা যায়। তবে এই ধরনের নতুন ও আরও উপযোগী 'চিলেটিং এজেন্ট'-এর খোঁজে গবেষণা কোথাও হচ্ছে বলে এখনও জানা নেই।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, আর্সেনিকের সবটুকুই খারাপ নয়। সম্প্রতি এক বিশেষ ধরনের ব্লাড ক্যান্সারের সর্বোত্তম ওষুধ হিসাবে আর্সেনিক অক্সাইড ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্ধারক জিনিসটি হল পরিমাণ। বহু রাসায়নিক পদার্থই অল্প মাত্রায় জীবনদায়ী কিন্তু বেশি মাত্রায় বিষ। পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে এবং এইরূপ জলীয় আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলে আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগের যে প্রাদুর্ভাব, তার জন্য আর্সেনিক দায়ী নয়, দায়ী আমাদের নির্বোধ ভাব। ইউনেস্কো বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহেবেরা জানেন না, বা বোঝেন না যে, কীভাবে আমরা এই টিউবওয়েল ব্যবহার করি— কারণ তাদের দেশে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত জলের রিসাইক্লিং কেউ দেখতে পায় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দাম অনেক, এবং পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্ন রেখে বিষের জন্য জীবন দেওয়া নেহাতই বোকামি।

লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়্গপুর-এ রসায়নের অধ্যাপক

গাঙ্গেয় অববাহিকায় প্যানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় জলে প্রায় ভরে থাকা মাটিতে প্রায় সব জলই কলেরা, আন্ত্রিক জাতীয় রোগের মূল।